Department of History
Ramsaday College
Amta, Howrah

Semester- IV (HISH) CC-9

Prepared by- Rittik Biswas

©rittik biswas

History (Hons)

CC-9

History of India (c1526-1605)

Unit- IV

Expansion and Integration

C. Conquest of Bengal

©rittik biswas

বাংলা ছিল মুঘল ও আফগান শাসনকালে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ । এই সময় বিভিন্ন শাসকরা বাংলার ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল। রাজনৈতিক দিক থেকে বাংলার ওপর প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে শাসকগোষ্ঠী বিচক্ষণ ভাবে তাদের রণনীতি পরিচালনা করে । বাংলায় এই সময় কোন একটিই বিশেষ শক্তি সমান্তরাল ভাবে রাজত্ব করতে পারেনি । দিল্লী কেন্দ্রিক ও স্থানীয় বিভিন্ন শক্তি এই সময় বাংলার ওপর প্রভাব বিস্তার করে ।

বাবর ১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করে যখন দিল্লীর কর্তৃত্ব দখল করেন সে সময় বাংলার শাসক ছিলেন হুসেনশাহী বংশের হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ। সেই পর্যায়ে বাবর দিল্লী থেকে এতদূরে বাংলার ওপর রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কোন স্বপ্ন দেখেন নি । পানিপথের যুদ্ধে মুঘলের হাতে পরাজিত ও বিতাড়িত হয়ে বহু আফগান সর্দার বাংলার সুলতান নসরৎ শাহের আশ্রয়প্রার্থী হন । এতে বাবর শংকাবোধ করেন । পরন্তু বিহারের আফগান - বংশীয় শাসক লোহানীরা মুঘল - বিদ্বেষী ছিলেন । লোহানীদের সাথে বাংলার নসরৎ শাহের যে যোগাযোগ ছিল , তাও বাবরের অজানা ছিল না । এমতাবস্থায় বাবর সসৈন্যে বাংলার দিকে অগ্রসর হন । নসরৎ শাহ ঘর্ঘরা ও গণ্ডক নদীর ওপর নৌবহর মোতায়েন করে মুঘলের অগ্রগতি রোধ করার উদ্যোগ নেন । কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে , এই সামান্য শক্তি নিয়ে দুর্ধর্ষ মুঘলের বিরোধিতা করা অসম্ভব । নসরৎ চূড়ান্ত বিপর্যয়ের আগেই বাবরের সাথে ১৫২৯ সালে সন্ধি স্বাক্ষর করে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দেন । নসরৎ শাহ বাবরের সাথে মিত্রতা রক্ষা করে চলার প্রতিশ্রুতি দেন । বাংলার সুলতান মুঘল – বিরোধী আফগানদের রাজনৈতিক আশ্রয় না দিতে প্রতিশ্রুত হন এবং ঘর্ঘরা নদী বাংলার পশ্চিম সীমানা বলে স্বীকৃত হয় ।

সুরজগড়ের যুদ্ধে মামুদ শাহ ও জালাল খাঁর একদল সেনাকে শের খাঁ পরাজিত করে দ্রত অগ্রসর হয়ে বাংলার তেলিয়াগড়ি অঞ্চল দখল করে এবং গৌড় আক্রমণ করে মামুদ শাহের কাছ থেকে বিশাল পরিমান ক্ষতিপূরণ আদায় করেন । ১৫৩৭ সালে শের খাঁ গৌড় আক্রমণ ও দখল করেন । গৌড় থেকে পালিয়ে গিয়ে গিয়াসুদ্দিন মামুদ শাহ সম্রাট হুমায়ুনের সাহায্য প্রার্থী হয় । শের খাঁর শক্তি বৃদ্ধি মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষেও শুভ না হওয়ায় ১৫৩৮ সালে বাংলাদেশ অভিমুখে হুমায়ুন রওনা হন । ইতিমধ্যে শের খাঁ বাংলায় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন তবে বিচক্ষণ এই

©rittik biswas

আফগান বীর মুঘলের সাথে যুদ্ধে নিজ শক্তিক্ষয় করার পরিবর্তে কুটকৌশলের সাহায্যে মুঘলদের ধৈয্যচ্যুতি ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেন । হুমায়ুন বাংলায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে শের খাঁ বিহারে বিনাবাধায় রোটাস , জৌনপুর দখল করে কনৌজের দিকে অগ্রসর হন । হুমায়ুন তখন গৌড় দখল করে আত্মতৃপ্তি ভোগ করছিলেন । অসলভাবে বাংলার জয়ের স্বপ্নে বিভোর থেকে হুমায়ুন মূল্যবান সময় নষ্ট করছিলেন । অন্যদিকে তখন শের খাঁ কনৌজ দখল করে দিল্লী জয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন । এই পরিকল্পনার খবর পাওয়া মাত্র হুমায়ুন তার ভুল বুঝতে পেরে দ্রুত দিল্লীর দিকে অগ্রসর হলে শের খাঁ চৌসা ও কনৌজের যুদ্ধে পর পর হুমায়ুনকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করেন । ফলত শুধু বাংলাই নয় , হুমায়ুনের হাতছাড়া হয়ে যায় দিল্লীর সিংহাসনও । বাধ্য হয়ে হুমায়ুন ভারত ছেড়ে পালিয়ে যায়। দিল্লীর সিংহাসনে বসে শের খাঁ শেরশাহে পরিণত হন । দিল্লীর ক্ষমতা হস্তগত করার পর শেরশাহ পুনরায় বাংলার দিকে দৃষ্টি দেন । বাংলা তার ক্ষমতার প্রাথমিক কেন্দ্র ছিল । তিনি বিস্মিত হন নি যে , বাংলার বিপুল ধন - সম্পদ তার শকিারী সেনাবাহিনী গঠনের প্রাথমিক সহায় ছিল । এবার তিনি খিজির খাঁ নামক জনৈক অনুচরকে বাংলার শাসক নিযুক্ত করেন । খিজিরখাঁ কিছুদিনের মধ্যেই বাংলার ভূতপূর্ব সুলতান গিয়াসউদ্দিনমামুদ শাহের কন্যাকে বিবাহ করে ক্ষমতা সঞ্চয় করেন এবং নিজেকে বাংলার স্বাধীন শাসক বলে ঘোষণা করেন । এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ শের শাহ স্বয়ং বাংলা অভিযান করেন এবং খিজিরখাঁকে বন্দী করে কাজী ফজিলভকে গৌড়ের শাসক পদে নিযুক্ত করেন । এই সময় শের শাহ বাংলায় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও বিদ্রোহ প্রবণতা রোধ করার উদ্দেশ্যে বাংলাকে কয়েকটি পরগণা এবং সরকার - এ বিভক্ত করেন । এর ফলে প্রাদেশিক শাসকের বিদ্রোহ প্রবণতা আপাততঃ হ্রাস পায় । কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে আঞ্চলিক তাবোধের জন্ম হয় । পরবর্তীকালে মুঘল শাসকদের এই স্থানীয় স্বাতন্ত্র্যবোধের সাথে লড়াই করতে হয় ।

শেরশাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ দিল্লীর সিংহাসনে বসেন (১৫৪৫ - ৫৩ সালে) । অতঃপর তার নাবালক পুত্র ফিরোজ শাহ স্বল্পকাল রাজত্ব করেন । শেরশাহের ভ্রাতুস্পুত্রমু বারিজ খাঁ ফিরোজকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন এবং ‘ মহম্মদ আদিল শাহ ’ নাম নিয়ে শাসন চালাতে থাকেন । কিন্তু তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর অথচ দুর্বল প্রকতির শাসক । ফলে আফগান সর্দারদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠে । এই সুযোগে তার হিন্দ সেনাপতি হিমু প্রকৃত ক্ষমতার কেন্দ্রে পরিণত হন ।

©rittik biswas

আদিল শাহের সমকালীন বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন মহম্মদ শাহ ' শামসুদ্দিন মহম্মদ শাহ গাজী ' উপাধি নিয়ে নিজেকে বাংলার স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন । জৌনপুর দখল করে তিনি আগ্রা দখলের জন্য অগ্রসর হন । কিন্তু আদিল শাহের হিন্দু সেনাপিত হিমু ১৫৫৫ সালে ছাপরাঘাটের যুদ্ধে মহম্মদ শাহকে পরাজিত ও নিহত করেন । অতঃপর আদিল শাহ শাহবাজ খাঁকে বাংলার শাসক নিযুক্ত করেন । কিন্তু শাহবাজ শাসন-দায়িত্ব গ্রহণের আগেই নিহত মহম্মদ শাহর পুত্র খিজির খাঁ নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করেন এবং শাহবাজ খাঁকে পরাজিত করেন । তিনি গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ উপাধি নিয়ে বাংলায় শাসন শুরু করেন ।

এই সময় দিল্লীতে রাজনৈতিক পালা বদল চলছিল । হুমায়ুন আফগান সুলতান সিকন্দর শাহ শুরকে পরাজিত করে দিল্লী ও পাঞ্জাবের ওপর মুঘল - কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন । কিন্তু তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেরশাহের বংশধর মহম্মদ আদিল শাহের সেনাপতি হিমু দিল্লী দখল করে নেয় । হুমায়ুনের নাবালক পুত্র আকবর ও তার অভিভাবক বৈরাম খাঁ ১৫৫৬ সালে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুকে পরাস্ত ও নিহত করে দিল্লী পুনর্দখল করেন । আদিল শাহ পূর্ব - ভারতের দিকে পশ্চাদপসারণ করে যান । কিন্তু সুরজগড়ের ৪ মাইল পশ্চিমে ফতেপুর নামক স্থানে বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর তার পিতৃহন্তাকে আক্রমণ করে হত্যা করেন । অতঃপর গিয়াসউদ্দিন বাহাদর জৌনপুরের দিকে অগ্রসর হন । কিন্তু অযোধ্যায় অবস্থিত মুঘল সেনাপতি খাঁন - ই - জামান তাকে পরাজিত করেন । গিয়াসউদ্দিন বাংলায় ফিরে আসতে বাধ্য হন । এরপর তিনি খাঁন - ই - জামানের সাথে মিত্রতা বজায় রেখে বাংলা শাসন করতে থাকেন । ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাহাদুর শাহ স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেন ।

গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তার ভ্রাতা জালাজউদ্দিন ' দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দিন ' উপাধি নিয়ে ১৫৬০ সালে বাংলার সুলতান হন । তিনিও মুঘলদের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলেন । এই সময় কররানী বংশীয় আফগানরা দক্ষিণ - পূর্ব বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের অনেকখাঁনি অংশ দখল করে বাংলার সুলতানের অস্বস্তি বৃদ্ধি করেছিল । কিন্তু বাংলার শাসক বংশের দুর্বল উত্তরাধিকারদের পক্ষে কররানীদের প্রতিহত করা প্রায় অসম্ভব ছিল । ১৫৬৩ সালে দ্বিতীয়গিয়াস উদ্দিনের মৃত্যু হলে তার পুত্র সিংহাসনে বসেন । কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যেই জনৈক ব্যক্তি তাকে হত্যা করে ' তৃতীয় গিয়াসউদ্দিন ' নাম নিয়ে বাংলার সিংহাসনে বসেন । এক বছর পরে কররানী বংশীয় তাজ

©rittik biswas

খাঁ তৃতীয় গিয়াসউদ্দিনকে হত্যা করে বাংলার সিংহাসন দখল করেন । ১৫৬৪ সালে বাংলায় কররানী বংশের শাসন শুরু হয় ।

কররানীদের আদি নিবাস আফগানিস্তানের বঙ্গাশ বা কুররম । শেরশাহের আমলে কররানী বংশের অনেকেই দিল্লীর প্রশাসনের সাথে জড়িত ছিলেন । এদের অন্যতম ছিলেন তাজ খাঁ । মহম্মদ আদিল শাহের আমলে ' কালাপাহাড় ' চরিত্রটি সম্পর্কে বিতর্ক আছে । দুর্গাচরণ সান্ন্যাল তাঁর বাঙ্গালীর সামাজিক ইতিহাস গ্রন্থে কালাপাহাড়কে ' ধর্মান্তরিত হিন্দু ' বলে উল্লেখ করেছেন । ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণ নাকি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের শোষণ ও অত্যাচার । ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর তিনি বহু হিন্দুমন্দিরধ্বংস করেন এবং দেবমূর্তি বিনষ্ট করেন । ড . রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে , এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ । ভ্রান্ত এবং কাল্পনিক । আবুল ফজলের ' আকবরনামা' বদাউনির মুনতাখাঁব - উৎ - তারিখ , নিয়ামত উল্লার মখজম - ই - আফগানী ' প্রভৃতি গ্রন্থের ভিত্তিতে জানা যায় যে , কালাপাহাড় ছিলেন জন্ম মুসলমান এবং আফগান । তিনি ' রাজু' নামে বেশি পরিচিত ছিলেন । সম্ভবতঃ রাজু নামটিকে হিন্দু ধরে নিয়ে এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে । কালাপাহাড় দক্ষ সেনাপতি ছিলেন এবং ইসলাম শাহের আমল থেকে কররানীর রাজত্বকালে বাংলার সেনাবাহিনীতে সেনাপতির কাজ করে দক্ষতা দেখান । দাউদ কররানীর মৃত্যুর পরে বিদ্রোহী পাঠান সেনাপতি মাসুম কাবুলীর সাথে কালাপাহাড় যোগ দেন এবং মুঘলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ১৫৮৩ সালে তিনি নিহত হন ।

তাজ খাঁ দিল্লী থেকে পালিয়ে আসেন এবং উত্তরপ্রদেশের গাঙ্গেয় অঞ্চলে স্বাধীন শাসন শুরু করেন । আদিল শাহের কাছে ছিবরামাউ - এর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি টাণ্ডায় চলে আসেন। ঐ অঞ্চলে তখন তাজ খাঁর ভায়ের জায়গিরদার হিসেবে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত ও তার ভায়েরা টাণ্ডায় প্রায় স্বাধীনভাবে শাসন চালাতে থাকেন । শেষ পর্যন্ত মন্ত্রী হিম চনারের নিকট ১৫৫৪ সালে এক যুদ্ধে কররানীদের পরাজিত করেন। কররানীরা বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন এবং দক্ষিণ - পূর্ব বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন । শেষ পর্যন্ত ১৫৬৪ সালে বাংলার সুলতান তৃতীয় গিয়াসুদ্দিনকে হত্যা করে তাজ খাঁ বাংলার সিংহাসন দখল করেন ।

সিংহাসনে বসার এক বছরের মধ্যেই তাজ খাঁ মারা যান । তার স্থলাভিষিক্ত সুলেমান কররানী । সুলেমান ছিলেন খুবই দক্ষ ও শক্তিশালী রাজনীতিবিদ । তার রাজ্যসীমা পশ্চিমে শোন নদী , পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং উত্তর - দক্ষিণে যথাক্রমে কুচ সীমান্ত থেকে পুরী পর্ব গত ছিল । সমকালীন

©rittik biswas

দিল্লী ও বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি কররানীদের উত্থানের পথ প্রশস্ত করে দেয় । শূর বংশের পতনের পর এবং বিভিন্ন আফগান শাখাঁগুলির ক্ষমতা সংকচিত হন , কররানী বংশ দ্রুত উত্থানের সুযোগপায় । অন্যদিকে দিল্লীতে মুঘল সম্রাট আকবর তখন উভয় ও পশ্চিম ভারতে তার ক্ষমতা সংহত করার কাজে বেশি ব্যস্ত ছিলেন । স্বভাবতই পূর্ব - ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণের বিশেষ তাগিদ তিনি অনুভব করেন নি । সুলেমান উচ্চাকাঙ্ক্ষী হলেও দিল্লীর মুঘল শক্তির বিরুদ্ধাচারণের পক্ষপাতী ছিলেন না । তাই পররাষ্ট্রনীতির মূল তত্ত্ব ছিল মুঘলশক্তির প্রতি আপাতঃ আনুগত্য বজায় রেখে সাম্রাজ্যের সীমানা সম্প্রসারণ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করা । এ কাজে তার প্রধান সহায়ক ও পরামর্শদাতা ছিলেন লোদী খাঁ । লোদীখাঁ ছিলেন গভীর কূটনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন চতুর রাজনীতিবিদ ।

১৫৭২ সালে সুলেমান কররানীর মৃত্যু হলে তার জ্যেষ্ঠপুত্র বায়োজিদ কররানী বাংলার সিংহাসনে বসেন । কিন্তু তার নিষ্ঠুরতা আফগান আমীরদের ক্ষুব্ধ করে তোলে । সুলেমানের । জামাতা হান্সু এক ষড়যন্ত্র দ্বারা বায়োজিদকে হত্যা করেন । কিন্তু সুলেমান কররানীর সুযোগ্য মন্ত্রী মিঞা লোদী হান্সুকে হত্যা করে বাংলার সিংহাসনে সুলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ কররানীকে প্রতিষ্ঠিত করেন । দাউদখাঁ ছিলেন অপরিণত রাজনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন , পরিণাম জ্ঞানহীন , আত্মগর্বী মানুষ । তার নৈতিক চরিত্রও ছিল হীন । কররানী বংশের অতি বিশ্বস্ত কর্মী তথা উজীর লোদীখাঁর জামাতাকে হত্যা করতেই তিনি কুণ্ঠিত হন নি । অথচ এই লোদীখাঁর সাহায্য ছাড়া দাউদ সিংহাসনে বসতেই পারতেন না । তাছাড়া লোদীখাঁর সাহায্য ও পরামর্শ ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । এমনকি পিতার অনুসৃত মুঘল তোষণনীতি পরিত্যাগ করে দাউদ কররানী নিজের নামে খুৎবা পাঠ করেন এবং মুদ্রা প্রচলন করেন । ফলে মুঘলদের সাথে বাংলার সংঘাত অনিবার্য হয়ে দাড়ায় । বস্তুতঃ তার রাজত্বকালের সবটাই জুড়ে ছিল মুঘলদের সঙ্গে সংঘর্ষ । আফগান - সর্দার গুজর খাঁ দাউদের ভ্রাতুস্পুত্রকে বিহারের স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করলে তাকে দমনের জন্য দাউদখাঁ মন্ত্রী লোদী খাঁকে বিহারে সসৈন্যে প্রেরণ করেন । এদিকে সম্রাট আকবরের নির্দেশে মুঘল সেনাপতি মুনিম খাঁও বিহার দখলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন । এই সুযোগে লোদী খাঁ দাউদ কর্তৃক জামাতা হত্যার প্রতিশোধ নেন । লোদী খাঁ ও গুজর খাঁ মিলিত ভাবে মুনিম খাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নেন এবং কররানী বংশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন । লোদী খাঁকে দমন করার জন্য দাউদকররানী সসৈন্যে পাটনা রওনা হন । দাউদ প্রতারণার দ্বারা লোদী খাঁকে হত্যা করেন । এদিকে মুনিমখাঁ পাটনা দখল করতে গিয়ে ব্যর্থ হন । আকবর স্বয়ং বহু বন্দুক ও হস্ত্রীবাহিনী সহ মুনিম খাঁর সাহায্যার্থেম

©rittik biswas

পাটনায় উপস্থিত হন । ১৫৭৪ সালে আকবর গঙ্গার উত্তর পাড়ে অবস্থিত হাজীপুর দুর্গের সামরিক গুরুত্ব অনুধাবন করে দ্রুত তা দখল করে নেন । এই স্থান থেকেই দাউদের রসদ সরবরাহ হত । হাজীপুর মুঘলদের দখলে চলে গেলে দাউদের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় । দাউদ অগত্যা পাটনা ছেড়ে রাতের অন্ধকারে বাংলায় পালিয়ে যান । আকবর দাউদের পশ্চাদ্ধাবন করে দরিয়াপুর পর্যন্ত আসেন । দাউদের ছেড়ে যাওয়া বহু সম্পদ ও হাতী মুঘলদের হস্তগত হয় । মুনিম খাঁকে দাউদের পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দিয়ে আকবর আগ্রায় ফিরে যান ।

তুকরাই - এর যুদ্ধ বাংলাদেশে মুঘল কর্তৃত্ব স্থাপন করলেও এখাঁনে আইন - শৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনতি ঘটে । বিহার ও বাংলায় দুজন মুঘল সুবাদার নিযুক্ত থাকলেও তাদের শক্তির অপ্রতুলতা , অধীনস্থ কর্মচারীদের অবাধ্যতা , লোভ এবং পারস্পরিক ঈর্ষা সাধারণ মানুষের সীমাহীন দুর্দশা ডেকে আনে । এদিকে দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে দাউদের সেনাপতি কালাপাহাড় মুঘল শিবিরগুলির ওপর ক্রমান্বয়ে আক্রমণ চালিয়ে তছনছ করছিলেন । তাই মুনিমখাঁ কটক থেকে সসৈন্যে ঘোড়াঘাটে উপস্থিত হয়ে কালাপাহাড়কে বিতাড়িত করেন এবং টাণ্ডায় ফিরে আসেন । কিন্তু বাংলার স্যাতস্যাতে আবহাওয়ায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং দেহরক্ষা করেন । মুঘল সৈন্যদের মধ্যে

অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে থাকে । এই সুযোগে মুঘলের শত্রুরা আবার ক্ষমতা দখলে সচেষ্ট হয়ে উঠে । মুঘল বাহিনী ভাগলপুর হয়ে প্রত্যাবর্তন করে । দাউদ কররানী পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন । খাঁন - ই – খাঁনান মুনিম খাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আকবর হুসেন কুলি বেগকে বাংলায় তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করে পাঠান । তার উপাধি হয় খাঁন - ই - জাহান ' । রাজা টোডরমল নিযুক্ত হন । তাঁর প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ । খাঁন - ই - জাহান ছিলেন পারসিক ও শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত কিন্তু এদেশে নিযুক্ত অন্যান্য অধিকাংশ মুঘল কর্মচারী ছিলেন সুন্নী ও তুর্কীস্থানী । তাই পরস্পরের মধ্যে আনুগত্যবোধের অভাব ছিল খুব প্রকট , যা প্রশাসনকে দুর্বল করে রেখেছিল । অবশ্য রাজা টোডরমল তার মধুর ব্যক্তিত্ব , বাগ্মিতা ও কৌশল দ্বারা একটা সামঞ্জস্য বিধান করতে সক্ষম । হয়েছিলেন । খাঁন - ই - জাহান লক্ষ্য করেন যে , দাউদখাঁ ভদ্রক ও জলেশ্বরসহ সমগ্র বাংলার ওপর পুনরায় স্বাধীন কর্তৃত্ব স্থাপন করেছেন । একই সঙ্গে জুনাইদ

©rittik biswas

কররানী দক্ষিণ - পূর্ব বিহারে এবং মাহানখাঁ পূর্ব বাংলায় মুঘল - কর্তৃত্ব অস্বীকার করে স্বাধীন রাজত্বের সূচনা করেছেন । এদিকে আতঙ্কিত মুঘল কর্মচারীরাও ভাগলপুর থেকে বাংলার দিকে অগ্রসর হতে আগ্রহী ছিল । । অবশ্য শেষ পর্যন্ত খাঁন - ই - জাহান ও টোডরমল তাদের মনে সাহস সঞ্চার করতে সফল হন । মুঘল বাহিনী খুব সহজে তেলিয়াগড়ি দখল করে নেয় । দাউদ খাঁ রাজমহলে আশ্রয় নেন । বেশ কিছুদিন অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকার পর ১৫৭৬ - এর ১০ই জুলাই উভয়পক্ষের মুখোমুখি সংঘর্ষ শুরু হয় । আকবরের নির্দেশে বিহার থেকে এক মুঘল বাহিনী খাঁন - ই - জাহানের সাথে যোগ দিলে মুঘলদের শক্তি বৃদ্ধি পায় । জুনাইদকররানী ও মাহান খাঁ নিহত হন । শেষ পর্যন্ত দাউদ আত্মসমর্পণ করেন । চুক্তিভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে তার মুণ্ডচ্ছেদ করা হয় । এইভাবে বাংলায় পুনরায় মুঘল কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় ।

১৫৭৬ সালে দাউদখাঁ কররানীর পরাজয় ও মৃত্যু ঘটলেও , বাংলাদেশে সার্বিকভাবেমুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে আরো প্রায় দুই দশক মুঘলদের লড়াই করতে হয়েছিল । কারণ কররানী বংশের পতনের পরেও বাংলার নানা অংশে আফগান নায়করা নিজেদের কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন । শুধুমাত্র মুঘল সর্দারদের কর্মকেন্দ্র এবং পার্শ্ববর্তী কিছু জনপদে মুঘল শাসন বলবৎ ছিল ।

১৫৭৬ - ১৫৯৬ পর্যন্ত কুড়ি বছর বাংলাদেশে চরম অরাজকতা দেখাঁ দেয় । মুঘল - কর্তৃত্ব শিথিল ও সীমিত , দেশের নানা স্থানে ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারীর দাপট । এই সকল জমিদারের অত্যাচার ও শোষণে জেরবার হচ্ছিল সাধারণ মানুষ । বিশৃঙ্খল আফগান সেনাদের মত মুঘল সেনারাও খুশিমত লুঠতরাজ দ্বারা অর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত থাকত । কর্তৃত্ব বিস্তারের জন্য জমিদারদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ছিল নিত্যকার ঘটনা । ড . রমেশচন্দ্র মজুমদার এই সময়কালকে ‘ চরম বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতার কাল ’ বলে অভিহিত করে বাংলায় । আটশো বছর পরে মাৎস্যন্যায় ’ অবস্থার পুনরাবির্ভাব ” বলে উল্লেখ করেছেন । এই সময় ‘ বার – ভুঁইয়া ’ নামে পরিচিত বাংলার জমিদারগণ মুঘলের সার্বিক কর্তৃত্ব বিস্তারের সাথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ান । ‘ বার – ভুঁইয়া ’ অর্থাৎ বারজন ভূম্যাধিকারী নামে অভিহিত হলেও এদের সংখ্যা ছিল বেশি । এই সকল

©rittik biswas

জমিদারের মধ্যে হিন্দু , মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিলেন । ১৫৭৮ সালে ডিসেম্বরে বাংলার মুঘলসুবাদার খাঁন - ই - জাহান মারা যান । পরবর্তী সুবাদার মুজফফর খাঁ যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন না । পরন্তু এই সময় আকবর নতুন প্রশাসনিক ও রাজস্বব্যবস্থা দ্বারা প্রাদেশিক মুঘল কর্মচারীদের ক্ষমতা খর্ব করার সিদ্ধান্ত নেন । ফলে বাংলার মুঘল কর্মচারীদের একাংশ বিদ্রোহী হয়ে উঠে । আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং কাবুলের শাসনকর্তা মীর্জা হাকিম এই সুযোগে বিদ্রোহী মুঘল কর্মচারীদের প্ররোচিত করতে থাকেন । মুজফফর খাঁ বিদ্রোহীদের হাতে পরাস্ত হন । বিদ্রোহীরা মীর্জা হাকিমকে ' সম্রাট ' বলে ঘোষণা করে । এইভাবে বাংলা , বিহার , উড়িষ্যার বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুঘল অধীনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ।

বাংলার বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে আকবর ১৫৮২ সালে খাঁন - ই - আজম কে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন । তিনি তেলিয়াগড়ির যুদ্ধে মাসুম কাবুলীর নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী পাঠানদের পরাস্ত করেন । মাসুম কাবুলী পূর্ববঙ্গে পালিয়ে গিয়ে স্থানীয় জমিদার ঈশা খাঁর সাথে যুদ্ধ চালান তবে তাকে চড়ান্তভাবে পরাস্ত করতে ব্যর্থ হন । মাসুম কাবুলী ও অন্যান্য পাঠান সর্দাররা মালদহ পর্যন্ত দখল করে নেন । অন্যদিকে উড়িষ্যার বিদ্রোহী আফগান নেতা কুলু খাঁ লোহানী বর্ধমান পর্যন্ত এগিয়ে আসেন । শাহবাজ খাঁ পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী বিদ্রোহীদের সাথে আপোসে চেষ্টা করেন । উৎকোচ প্রদান করে বহু পাঠান সর্দারকে বশীভূত করেন । শেষ পর্যন্ত ১৫৮৬ সালে ঈশা খাঁ ও মাসুম কাবুলীও মুঘলের মৈত্রী পূর্ণবশ্যতা মেনে নেন ।

১৫৮৭ সালে বাংলাদেশে আকবরের নতুন শাসন - পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় । বাংলা সবার সর্বোচ্চে থাকেন সিপাহশালার । পরে এই পদটি সুবাদার নামে অভিহিত হয় । এর অধীনে দেওয়ান , বকশি , সদর কাজী , কোতোয়াল ইত্যাদি বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত হন । নতুন ব্যবস্থা অনুসারে প্রথম সিপাহশালার নিযুক্ত হন ওয়াজিব খাঁ । ওয়াজিবের আমলে বাংলায় আফগান সর্দার ও আঞ্চলিক জমিদারদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পায় ।

আকবরের নির্দেশে মানসিংহ ১৫৯০ সালে পূর্ব - ভারত অভিযান করে বিহার ও উড়িষ্যার বিদ্রোহী আফগান ও জমিদারদের দমন করেন । তাই ওয়াজিব খাঁর মৃত্যুর পর আকবর মানসিংহকে

©rittik biswas

বাংলার সুবাদার নিয়োগ করে পাঠান । এই সময় ময়মনসিংহের ঈশা খাঁ , ভূষণার কেদার রায় , মাসুম কাবুলি , উড়িষ্যার কুলু খাঁর ভ্রাতুস্পুত্র ওসমান খাঁ প্রমুখ যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন এবং মুঘল কর্তৃত্বকে নানাভাবে বিব্রত করছিলেন । মানসিংহ বাংলায় এসেই এদের দমন করার উদ্যোগ নেন । তার প্রধান সহায়ক ছিলেন তার পুত্রদ্বয় — হিম্মৎ সিংহ ও দুর্জন সিংহ । হিম্মৎ সিংহ কেদার রায়কে পরাজিত করে ভূষণা দুর্গ দখল করেন । ১৫৯৫ সালে মানসিংহ রাজমহলে নতুন রাজধানী স্থাপন করে তার নাম দেন ' আকবরনগর ' । অতঃপর তিনি ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তার জমিদারীর অধিকাংশ অঞ্চল দখল করে নেন । ঈশা খাঁ মানসিংহের মনোযোগ ঘুরিয়ে দেবার জন্য মুঘলের মিত্র কুচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের বিরুদ্ধে তার জ্ঞাতি ভ্রাতা রঘুদেবকে প্ররোচিত করেন । লক্ষ্মীনারায়ণের অনুরোধে মানসিংহ কুচবিহারের সাহায্যে অগ্রসর হলে ঈশা খাঁ পালিয়ে যান । অতঃপর দুর্জন সিংহ ঈশা খাঁর বাসস্থান কত্রাভূ দখল করতে অগ্রসর হন । কিন্তু ঈশা খাঁ ও মাসুমখাঁর হাতে মুঘলবাহিনী পরাজিত হয় । কিন্তু বিচক্ষণ ঈশা খাঁ দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষ এড়ানোর মুঘলের সাথে মিত্রতার প্রস্তাব করেন এবং ১৫৯৭ সালে আকবরের বশ্যতা মেনে নেন ।

এই সময় মানসিংহের দুই পুত্র হিম্মৎ সিংহ ও দুর্জন সিংহ পর পর মারা যান । শোকাহত মান সিংহ জ্যেষ্ঠপুত্র জগৎ সিংহের হাতে বাংলার শাসনভারদিয়ে বিশ্রামের জন্য আজমীরে চলে । যান । কিছুদিনের মধ্যেই অসুস্থ অবস্থায় জগৎ সিংহ মারা যান । তার স্থলাভিষিক্ত হন তার পুত্র মহাসিংহ । মুঘল সুবাদার বংশের এই দুর্দিনে আবার পাঠান সর্দার ও জমিদাররা তাদের ক্ষমতা বিস্তার করতে সক্ষম হয় । মানসিংহ সত্বর বাংলায় ফিরে আসেন এবং একে একে বিদ্রোহীদের দমন করতে অগ্রসর হন । কেদার রায় তার বশ্যতা মেনে নেন । মানসিংহ উড়িষ্যার কুলু খাঁ র ভ্রাতুস্পুত্র বিদ্রোহী ওসমানকে দমন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেদার রায় আবার মুঘল বিরোধী জোট গড়ে তোলেন । কেদার রায় , ঈশা খাঁর পুত্র মুসা খাঁ ও অন্যান্য জমিদাররা জোটবদ্ধ হন । মানসিংহ এই জোট ভেঙ্গে দেন । এবার কেদার রায় মগ জলদস্যুদের সাথে মিলিত হয়ে শ্রীনগরে মুঘল ঘাটি আক্রমণ করেন । বিক্রমপুরের যুদ্ধে কেদার রায় বন্দী ও নিহত হন । ওসমান উড়িষ্যায় পালিয়ে যান এবং মগ - দস্যুরাও স্বদেশে চলে যেতে বাধ্য হয় ।

©rittik biswas

১৬০৫ সালে জাহাঙ্গীর সিংহাসনে বসে মানসিংহকে বাংলার সুবাদার পদে নিয়োগ করেন । কিন্তু বর্ধমানের জায়গিরদার শের আফগানের সুন্দরী স্ত্রীর রূপমুগ্ধ হয়ে জাহাঙ্গীর তাকে লাভ করার উদ্দেশ্যে মানসিংহকে সরিয়ে বিশ্বস্ত অনুচর কুতুবউদ্দিনকে বাংলার শাসক নিযুক্ত করেন । ঘটনাক্রমে যুদ্ধে দু জনেই নিহত হলে জাহাঙ্গীর শের আফগানের বিধবা পত্নীকে মুঘল হারেমে নিয়ে আসেন এবং প্রায় চার বছর পর বিবাহ করেন, পরে ইনিই নুরজাহান নামে খ্যাত হন । বাংলার শাসন ব্যবস্থা পরবর্তী সময়ে কিছুকাল মুঘল সম্রাটদের শাসনরীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে চলেছিল ।

তথ্য সহায়তা

মুঘল যুগে ভারত- জি. কে. পাহাড়ী

Wikipedia.org

©rittik biswas